

'When Marriage is not a Marriage? Sex, Sacrament and Contract in Hindu Marriage' by Patricia Uberoi in *Contributions to Indian Sociology*, Vol. 1 and 2, PP: 319- 345.

পেট্রিসিয়া উবেরয় তাঁর এই প্রবন্ধ সূচনা করেছিলেন হিন্দু বিবাহ আইনের সমালোচনার মধ্য দিয়ে। জে. ডি. এম. ডেরেট এর উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণ বিবাহ, পরিবার, আত্মীয়তার সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনা করলেও বৈবাহিক মামলা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। ডেরেটের মতে সমস্যাটা হল আমাদের দেশে বিবাহ সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে তা মূলত আধুনিক এবং পশ্চিমের আইন দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের আইন যখন এমন এক সমাজে প্রয়োগ করা হয় যা মধ্যযুগীয় তখন নানান ধরনের সমস্যার সূচনা হয় (1976)।

এই প্রবন্ধে উবেরয় বিবাহের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। বিবাহ একটি পবিত্র সংস্কার নাকি সামাজিক চুক্তি? হিন্দু বিবাহ আইনে বিগত বেশ কয়েক বছরে যেসকল পরিবর্তন ঘটেছে তাতে মূলত বৈবাহিক সম্পর্কের পরিবর্তনের বিশেষ করে পবিত্র আচার অনুষ্ঠান থেকে সামাজিক চুক্তি তে বিবাহের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কে ব্যাখ্যা করা হয়। এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট রূপ আমরা দেখি একটি অভিন্ন নাগরিক আইনের আবেদনের মধ্য দিয়ে। আধুনিকীকরণের সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবেশ ঘটে যার ফলে নাগরিক আইন চার্চের নিয়ম থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এসবের পরেও 'পবিত্র রীতি নীতি থেকে চুক্তি-তে' বিবাহের আইনের এই যে বিবর্তন তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নয়। ডেরেট এই প্রসঙ্গে ইংলিশ আইনের কথা মনে করিয়েছেন যেখানে বিবাহকে সকল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি পবিত্র অনুষ্ঠান বলে গন্য করা হয়েছে যেখানে বলে হয় যে বিবাহ হল মূলত বেশ কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। চুক্তিস্বরূপ বিবাহের ধারণাটি হিন্দু বিবাহ আইনে স্বীকৃতি পেলেও বিবাহের পবিত্র আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধারণাটি কোনভাবেই দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না।

বিবাহ যদি চুক্তি হয়ে থাকে তাহলে একথা বলতেই হবে যে এটি একটি অনবদ্য চুক্তি। ক্যারল পেট্‌মান তাঁর 'The Sexual Contract' এ বলেছেন যে বিবাহ এমন একটি চুক্তি যা অন্য সকল প্রকার চুক্তি থেকে আলাদা। এই চুক্তি দুজন বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়, যা রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিদ্বয় কে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং যেখানে যৌন সম্পর্ক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আরো মনে করা হয় যে এই চুক্তির স্থায়িত্ব হবে আমৃত্যু এবং রাষ্ট্র অনুমোদন করলে তবেই এই চুক্তি ভাঙ্গা সম্ভব। বৈবাহিক সম্পর্কের অভ্যন্তরে সম্মতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক ক্রিমিনাল আইনের আওতায় আসেনি যদি না স্ত্রীর বয়স নির্দিষ্ট সীমার নিচে হয়।

বিবাহ চুক্তি না ধর্মীয় বিধি এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় রাখমাবাই এর কেস এ। রাখমাবাই একজন বালিকা যার বাল্য বয়সে বিবাহ হয় দাদাজি ভিকাজির সঙ্গে। তাদের সেভাবে কখনো বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরী হয়না এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে রাখমাবাই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করে যদিও দাদাজি ভিকাজি তাদের সম্পর্ক ধরে রাখার কথা বলে।

ট্রায়াল কোর্ট এ ভীকাজির এই আবেদন খারিজ হয় এই বলে যে রাখমাবাই বিবাহের সময় নাবালিকা ছিল তাই সে কোনভাবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বৈবাহিক সম্পর্ক যেহেতু সেইভাবে কখনও তৈরী হয়নি তাই তাকে ধরে রাখার প্রশ্নও গুরুত্বহীন। তৃতীয়ত এখন যেহেতু রাখমাবাই সাবালিকা এবং নিজের স্বাধীনতা তাঁর কাছে মূল্যবান তাই জোর করে বিবাহ টিকিয়ে রাখতে বলা অনুচিত।

রাখমাবাই এর এই ঘটনা বিবাহের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৯১ সালে **Age of Consent** বিল প্রকাশ্যে এলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। একশ বছরেরও বেশি সময় পেড়িয়ে গেলেও বিবাহ চুক্তি নাকি পবিত্র আচার তা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। হিন্দু বিবাহ আইন এবং বিচার ব্যবস্থাও এই দুটি দিকের উপরেই আলকপাত করেছে। হিন্দু আইন যা ইংলিশ আইন দ্বারা প্রভাবিত সেখানে যৌন সম্পর্কযুক্ত বিবাহ কে বৈধ হিন্দু বিবাহ বলে গন্য করেছে আর যৌন সম্পর্কবিহীন বিবাহ কে নাকোচ করেছে।

### হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫

বহু সমস্যা ও বাধাবিপত্তি কাটিয়ে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হয় ১৯৫৫ সালে। এই নতুন আইন কারো কাছে খুবই বৈপ্লবিক ছিল আবার অনেকের কাছে ছিল হতাশাজনক। ডেরেট এর মতে হিন্দু বিবাহ আইনে এমন কিছুই ছিল না যার জন্য একে বিশেষভাবে হিন্দু বলা যাবে। এই আইনে যে কটি হিন্দু বৈশিষ্ট্য ছিল তা হোল ঃ ১) হিন্দু ধর্মাবলম্বী হতে হবে। ২) নিষিদ্ধ এমন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া বা স্বপিত্ত আত্মীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না। ৩) হিন্দু আচার অনুষ্ঠান মেনে বিবাহ সংঘটিত হতে হবে তা আধুনিক বাধ্যতামূলক রীতিনীতি সমূহ হতে পারে বা চিরাচরিত ও ঐতিহ্যমন্ডিত সপ্তপদীর মাধ্যমেও হতে পারে।

### পবিত্র আচার হিসেবে বিবাহ

হিন্দু বিবাহ আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন হলেও বিচারব্যবস্থায় বিবাহকে মূলত একটি পবিত্র আচার বলেই মনে করা হয় এবং এও বলা হয় যে বিবাহ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা ছোটখাটো সমস্যার জন্য কখনো ভেঙ্গে যেতে পারে না।

বিবাহ এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা শুধুমাত্র স্বামী/স্ত্রী-র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করে তা নয়, পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষার দিকটির প্রতিও খেয়াল রাখে। কোর্ট কখনই শুধুমাত্র স্বামী বেশ কিছু ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছেন বলে স্ত্রীয়ে় সম্পর্ক ধরে রাখার ইচ্ছে কে নাকোচ করতে পারেনা।

বিচারপতি যখন বিবাহকে পবিত্র আচার হিসেবে দেখেন তখন তাদের মাথায় মূলত এই ধারণাটি প্রভাব বিস্তার করে যে বিবাহ হল এমন এক বন্ধন যা অটুট। ডেরেট বলেছেন যে বিবাহ সংস্কার ও আচার হিসেবে স্ত্রী দে় তাদের স্বামীর পরিবারের সদস্য করে তোলে, শুধু তাই নয় স্বামীর মাতা পিতার সাথেও এক সম্পর্ক তৈরী হয় এবং এই সম্পর্ক এমনই হয় যে মনে হয় যেন স্বামীর পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়েছে। এর ফলে বিবাহ এমন সম্পর্ক তৈরী করে

যা অটুট বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমের দেশে বিবাহের অর্থ হল মূলত স্বামী স্ত্রীয়ে  
সম্পর্ক , এবং এখানে একে অন্যের পিতা মাতার প্রতি নির্লিপ্ত থাকা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

### বিবাহ যখন চুক্তি

পবিত্র আচার হিসেবে বিবাহের ধারণা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমরা কি বলতে পারি  
যে বিবাহ একটি চুক্তি? হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫) এবং বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪) এ এই  
ধারণা তুলে ধরা হয়েছে যে বিবাহ একটি চুক্তি যা অন্যান্য চুক্তিরই সদৃশ।

দুজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় এই চুক্তিতে প্রবেশ করে এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত কারণের  
ভিত্তিতে এই চুক্তি সমাপ্ত করা সম্ভব। এই চুক্তিতে প্রবেশের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি  
প্রয়োজন এবং এই সম্মতির বিষয়টি হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যিক শর্ত।

হিন্দু বিবাহ আইনে চুক্তির শর্ত হিসেবে সম্মতির বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। দুজন হিন্দুর  
মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হতে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ আবশ্যিকঃ ১) বিবাহের সময় দুই পক্ষকেই  
তাদের স্বজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে বিবাহে সম্মতি দিতে হবে, ২) পাত্রের বয়স কম করে ২১ ও  
পাত্রীর বয়স ১৮ হতে হবে । যদিও বিবাহে সম্মতির প্রশ্নে এই দুটি নিয়মের কোনটাই খুব  
একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই আইনের সংশোধন করে পরবর্তীকালে আরো বলা হয় যে ক)  
বিবাহের সম্মতি দিলেও দুপক্ষের কোন একজন যদি মানসিকভাবে সুস্থ না হয় তাহলে সে  
বিবাহে পক্ষে উপযোগী নন, খ) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অথবা বিকারগ্রস্ত হলে বিবাহের পক্ষে উপযুক্ত  
নন। এই শর্তগুলি শুধুমাত্র বৈবাহিক সম্মতি গ্ৰাপনের জন্য নয় আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশেষ  
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমত এর দ্বারা বিবাহবদ্ধ দুজন ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে  
তাদের ভেবেচিন্তে স্বজ্ঞানে এই বিবাহে আবদ্ধ হতে হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে এই সম্মতি যদি  
জোর করে বা শঠতার আশ্রয়ে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলেও সেই বিবাহ বৈধ বলে গন্য করা  
হবে যদিও যে ব্যক্তিকে ঠকানো হল সে চাইলে সে তাঁর বিবাহকে খারিজ করতে পারে বা  
খারিজ করার আবেদন করতে পারে এই শঠতার কারণ দেখিয়ে। **Indian Contract Act**  
অনুসারে শঠতার সংগা দেওয়া মুশকিল তবে শঠতার ধারণাটিকে বোঝা সম্ভব এই ধারণার  
ভিত্তিতে যে বিবাহ একটি সংস্কার কোন চুক্তি নয়। মনে করা হয় যে বিবাহের ক্ষেত্রে সম্মতি  
অপরিহার্য নয়। যদি বিবাহের সমস্ত রীতি নীতি সঠিকভাবে পালন করা হয় এবং এমন দুজন  
মানুষের মধ্যে বিবাহ হয় যারা একই গোত্রের নয় বা তাদের মধ্যে সম্পর্ক নিষিদ্ধ নয় তাহলে  
বিবাহের পথে বিশেষ কোন বাধা থাকে না যদি না দু পক্ষের একজন শঠতার আশ্রয় নেয়।  
হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে শঠতার ভিত্তিতে বিবাহ নাকোচ শুধুমাত্র সেইসকল ক্ষেত্রে গ্রাহ্য  
যেখানে বিবাহের ক্ষেত্রে সম্মতি নেওয়া হয়েছে ছলের মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষে বিবাহের ক্ষেত্রে সম্মতির ব্যাপারটি নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করার বিষয় বিশেষ  
করে সম্বন্ধ বিবাহ ও বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে। এখানে পাত্র পাত্রীর সম্মতি একেবারেই তাদের  
নিজেদের হওয়া উচিত। এই সম্মতি পুরোপুরিভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে , সারাজীবন একসাথে  
থাকার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ মানুষের সাথে চুক্তির জন্য নয়। প্রমিলা কাপুর (১৯৭০) শহুরে

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর গবেষণা করে জানার চেষ্টা করেছিলেন যে বিবাহে তাদের সম্মতি ছিল কিনা এবং থাকলেও তা কতটা ছিল? কোর্টে এবং বিভিন্ন গবেষণায় যা উঠে এসেছে তা হল বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীয়ে়র সম্মতি তাদের পিতা মাতা, বাড়ির বয়োঃজ্যেষ্ঠ , বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের মারফত আসে। বৈবাহিক সম্পর্ককে ধরে রাখা তাই এক সামাজিক দায়বদ্ধতায় পরিনত হয়। বিবাহের যে সারাজীবনের অটুট সম্পর্কের ধারণা তা আধুনিক সমাজের জন্য যথাযথ নয়।

যদি কোন সন্তান তাঁর পিতাকে তার জন্য পাত্রী দেখার দায়িত্ব দিয়ে থাকে এবং পিতা স্বজ্ঞানে এমন একজন মেয়েকে পছন্দ করেন যার কিছু শারীরিক সমস্যা আছে , এমন পরিস্থিতিতে সন্তান এই বলে নিজের বিবাহ খারিক করতে পারবেনা যে তাকে মেয়েটির অসুস্থতার ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি কারণ পাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব পুত্র নিজেই তার পিতাকে দিয়েছিল, সুতরাং পিতার সম্মতিই এখানে শেষ কথা হবে। তাই বিবাহ শুধুমাত্র চুক্তি নয় আবার চুক্তিও বটে। একটি চুক্তির যে সকল বৈশিষ্ট্য বা শর্ত রয়েছে তার সবকটি বিবাহের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাইনা ঠিকই তবে যেকোন চুক্তির ক্ষেত্রে সম্মতির প্রয়োজন। এখানে সন্তান তার পিতাকে পাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছে তাই ধরে নেওয়া হবে যে পিতার সম্মতিই হল পুত্রের সম্মতি।

হিন্দু বিবাহ আইনের ১২ নং ধারায় বিবাহের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে বৈবাহিক সম্পর্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে মানসিক সুস্থতা ও স্থিরতার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও বিবাহের ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা বা সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে শারীরিক অসমর্থতাকে কখনই যৌন সম্পর্ক চরিতার্থ করার ব্যাপারে বাধা হিসেবে দেখা হয়না। যদিও এইসব অসম্পূর্ণতাকে পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে দেখা হয় বিশেষ করে মানসিক সুস্থতা ও স্থিরতার সঙ্গে গৃহকর্মের অসমর্থতা ও মাতৃত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। অলকা শর্মা ও অবিনাশ কুমার শর্মার কাজ থেকে মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে গৃহকর্মে অমনোযোগিতার প্রশ্ন উঠে এসেছে। তাঁরা তাদের কাজে এমন কিছু মহিলাদের কথা তুলে ধরেছেন যাদের মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে তাদের গৃহকর্মের অমনোযোগিতার বিষয় উঠে এসেছে। শর্মা এবং শর্মা একজন মহিলার উদাহরণ দিয়েছেন যিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ হওয়ায় গ্যাস জ্বালিয়ে আগুন ধরতে ভুলে গেছেন, প্রয়োজনের তুলনার বেশি দুধ কিনেছেন যাতে দুধ নষ্ট হয়, রিক্সায় বাড়ি ফিরতে গিয়ে টাকার ব্যাগ ফেলে চলে এসেছেন, রুটি করতে গিয়ে পরোটা বানিয়ে ফেলেছেন, বারান্দায় প্রস্রাব করে ফেলেছেন , এবং পত্নী তার জন্য মানসিক চিকিৎসক আনার কথা বলায় পত্নীকে কুকথা বলেছেন ইত্যাদি। এসব লক্ষণ দেখে বিচারপতি মন্তব্য করেন যে একজন মহিলা যার নিজের আচরণের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যে রান্নাঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র সামলাতে অসমর্থ, যে পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে অসমর্থ তাকে কখনই দায়িত্বশীল বলা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল বিবাহ চুক্তি হলে দুপক্ষের স্বজ্ঞানে সম্মতির ব্যাপারটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক নয় তাঁর বিবাহের ক্ষেত্রে সম্মতি দানের ব্যাপারটি শুধুমাত্র গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে তা শুধু নয় স্ত্রীয়ে়র অসংগতিপূর্ণ আচরণ বিবাহকে কতটা ধরে রাখতে পারবে সেই প্রশ্নও এখানে সামনে আসছে।

বিবাহে সম্মতির অর্থ যৌন সম্পর্কেও সম্মতি। যৌন সম্পর্কে অসমর্থতার ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করা যেতে পারে। ষোলো বছরের নিম্নে কোন কন্যার সঙ্গে বিনা সম্মতির যৌন সংসর্গ কে শ্লীলতাহানির পর্যায়ে ফেলা হয়। বিবাহ পরবর্তী স্বামী স্ত্রীয়ে বিনা সম্মতিতে যৌন সম্পর্ককে শ্লীলতাহানি তখনই বলা হবে যখন স্ত্রীয়ের বয়স বারো। আর বারো থেকে ষোলো বছরের মধ্যে স্ত্রীয়ের বয়স হলে তার শাস্তি যৎসামান্য।

### Judicial Ethnosexology

সংস্কার অথবা চুক্তি হিসেবে বিবাহের ভূমিকা সম্পর্কে হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত ডিসকোর্সে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং বিচারপতিরাও এই নিয়ে কোন একটি বিশেষ জায়গায় পৌঁছতে পারেননি। ভারতের হিন্দু বিবাহ আইন যা মূলত **English Matrimonial Causes Act** এর মডেলে তৈরী হয়েছে তাতে যে অনেক ফাঁক আছে তা কোন আইনজীবী বা বিচারপতিই অস্বীকার করতে পারেননি। ইংলিশ মডেলের অনুকরণে গঠিত হিন্দু বিবাহ আইনের ১২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে বিবাহ তার গুরুত্ব হারায় যদি তাতে আবদ্ধ একজন ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হয়। এখানে শারীরিক অক্ষমতা বলতে মূলত যৌনাঙ্গের কর্মক্ষমতার অভাবকেই বোঝানো হয়েছে। মানসিক অক্ষমতা বলতে মানসিকভাবে যৌন সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণের অভাবকে বোঝান হচ্ছে। তবে এই যৌন সম্পর্কের প্রতি অনিহার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্মতি না দেওয়ার ব্যাপারটাকে এক করলে চলবে না। দিওয়ান ও দিওয়ান (১৯৯৩) এর মতে দুজন ব্যক্তিকে তাদের যৌন সম্পর্ক চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য একটি ঘরে তিন দিন তিন রাত আটকে রাখার পরেও যদি তাদের মধ্যে কোনপ্রকার যৌন সম্পর্ক তৈরী না হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে সেই দুজন ব্যক্তির বা তাদের মধ্যে একজনের কোন না কোন শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা রয়েছে।

স্ত্রী বা পুরুষের যৌনাঙ্গের কর্মক্ষমতা বৈবাহিক আইনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। যৌনাঙ্গের প্রয়োগ বিশেষ করে পুরুষাঙ্গের প্রয়োগ যদি বলপূর্বক ও সম্মতি ছাড়া হয় তাহলে তা রেপ হিসেবে এবং অনেক সময় তা যদি অন্যান্য প্রানীর সাথে করা হয়ে থাকলে তাহলে তাকে নন ভার্জাইনাল সোডমি হিসেবে চিনহিত করা হবে। আইনি মতে এই ভার্জাইনাল বা পেনাল পেনিট্রেশন রেপ ছাড়াও অন্য বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন হাতের আঙ্গুল বা অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসপত্র, বা শিশুদের উপর যৌন বাসনা চরিতার্থ করা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ভার্জাইনাল পেনিট্রেশন না হলেও একে রেপ বলা হবে যেহেতু এখানে কোন না কোন ভাবে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের পূর্বে ভার্জিন (যে কখনো কোনরকম যৌনকর্মে লিপ্ত ছিলনা পূর্বে) হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কারন মহিলাদের সব সময় কল্পনা করা হয় যে তারা দুজন পুরুষের (পিতা ও স্বামী) মধ্যকার পবিত্র আদানপ্রদানের বস্তু। বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার অর্থ তাঁর চরিত্রহানি ঘটা। ওখচ একটি বৈধ বিবাহের মধ্যে কোন স্ত্রী যদি যৌন কর্মে লিপ্ত হয় তাহলে স্ত্রী ও স্বামীর সম্পর্ক মজবুত হয় বলে ধরে নেওয়া হয়।

যৌন সম্পর্কে অক্ষমতা (Impotency), বন্ধ্যাত্ব-র (sterility) থেকে আলাদা। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে যৌন সম্পর্কে অক্ষমতার বিষয়টি মূলত পুরুষদের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যদিকে বন্ধ্যাত্বের ব্যাপারটা মহিলাদের সাথে যুক্ত। প্রথমটি বলতে সাধারণত বোঝায় যে যৌন সম্পর্কের প্রতি অনিহা বা ইচ্ছে থাকলেও যৌনাঙ্গ কাজ করতে অক্ষম। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সন্তানের জন্মদানে অক্ষমতাকে বোঝান হয়। বিবাহ আইনত খারিজ করার প্রশ্নে প্রচলিত নিয়ম ও বিবাহ সম্পর্কিত নতুন আইন (১৯৪০) এর মধ্যে পার্থক্য দেখা দিল। ইতিহ্যগত নিয়ম অনুসারে যেসকল পুরুষেরা সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম তাদের পুরুষ বলে গন্য করা যায় না। অ্যাংলো আমেরিকান আচরনবিধি অনুযায়ী যদি কোন পুরুষ তার যৌনাঙ্গ-র প্রয়োগ ঘটাতে পারে তাহলে তাকে সক্ষম বলে গন্য করা হয় আবার কোন মহিলার ক্ষেত্রে সে যদি যেকোন রকম পেনিট্রেশন নিতে সক্ষম হয় তার জরায়ু না থাকা সত্ত্বেও বা তার বন্ধ্যাত্ব থাকলেও সেই মহিলাকে সক্ষম বলে মনে করা হবে। অন্যদিকে ধর্মশাস্ত্র জরায়ুবিহীন মহিলাদের মহিলা বলে গন্য করে না শুধু তাই নয় সন্তানের জন্মদানে স্ত্রী অক্ষম হলে তার স্বামীর পুনর্বিবাহও ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত।

সমাজতাত্ত্বিক জি. এস. ঘুরে ভারতীয় হিন্দু বিবাহে যৌন সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করেছিলেন। তাঁর মতে স্বামী স্ত্রীয়ে়র সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে যৌন সম্পর্কের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শারীরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৈবাহিক জীবন সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে অসম্মতি জানানো স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই এক ধরনের প্রতিবাদের সামিল। স্বামীর ক্ষেত্রে এই প্রতিবাদ হতে পারে অপর্യാপ্ত পণ অথবা স্ত্রীয়ে়র কোন ত্রুটির (imperfection) বিরুদ্ধে। স্ত্রীয়ে়র ক্ষেত্রে এই প্রতিবাদ হতে পারে স্বামীকে অপছন্দ হওয়ার কারণে।

বিভিন্ন আইনি কেস এর উপর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডেরেট মন্তব্য করেছেন যে একধরনের "এলিমেন্টারি কোর্টশিপের" চাহিদা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে। এই এলিমেন্টারি কোর্টশিপ যৌন সম্পর্কে নির্মমতাকে বন্ধ করতে, স্ত্রীয়ে়র যখন এমন একজনের সাথে (স্বামী) যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় যাকে আগে কোনদিন দেখিনি এবং যখন সে তাঁর স্বামীর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে এইসকল ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের পরে প্রথম রাত বিয়ের ভবিষ্যত নির্ণয় করে। এ প্রসঙ্গে সুব্রামানিয়ান বনাম সান্তা-র কেসটা উল্লেখযোগ্য। এখানে এই ব্যক্তি তার ১৮ অনুর্ধা স্ত্রী কে কোর্টে আনার আবেদন জানায় তার স্ত্রীয়ে়র দায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বলা হয়েছে যে এই ব্যক্তি বিয়ের রাতে তার স্ত্রীয়ে়র উপর নির্মমতার পরিচয় দিয়েছেন। যার ফলে স্ত্রী তার পিতার গৃহে চলে গেছে এবং সে আর তার স্বামীর গৃহে ফিরতে ইচ্ছুক নয়। এর উত্তরে স্বামী একটি চিঠি লেখে তাতে তার অ্যাফিডেভিট এর কথা তুলে আনা হয় যেখানে বলা হয়েছে যে তার স্ত্রীয়ে়র আচার আচরণ নির্ধারিত হবে তার স্ত্রীয়ে়র প্রতি তার চুম্বন অথবা লাথির ভিত্তিতে তাই কোন পরিস্থিতিতেই তার স্ত্রীয়ে়র পিতা তাকে তার স্ত্রীয়ে়র উপর অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। জাস্টিস এ. আইয়ার এই চিঠির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে এই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে নিজের অধিকারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

করেছেন এবং তার স্ত্রীয়েৰ অধিকাৰ এবং অনুভূতিৰ কোন কদৰ করেননি। তিনি আৰো বলেন যে বিবাহেৰ অন্যতম ভিত্তি হল শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কিন্তু সেটা সঠিকভাবে কৰা প্ৰয়োজন। বিয়েৰ দিন স্বামীৰ আচৰনে স্ত্ৰী এতটাই ভীত হয়ে পড়ল যে তাকে তার পিতাৰ গৃহে ফিৰে আসতে হল। অথচ স্বামী-ৰ সঠিক আচৰনেৰ মধ্য দিয়ে তার স্ত্ৰীয়েৰ মন জয় কৰাৰ সুযোগ ছিল কিন্তু স্বামী তা করেননি। স্বামী যদিও বলছে যে তােদেৰ মধ্যে সব কিছুই ঠিক ছিল কিন্তু এই বিয়ে অন্যান্য বিয়েৰ মত যদি হত তাহলে স্ত্ৰী এত ভীত সন্তুষ্ট হয়ে তার পিতাৰ গৃহে বসে থাকতো না। কোথাও একটা সমস্যা তো ছিলই। শেষমেশ বিচাৰপতি ওই ব্যক্তিৰ আবেদন খাৰিজ কৰে দিল তার কাৰণ তােদেৰ সম্পৰ্কে আৰো একবাৰ সুযোগ দেওয়ার স্বার্থে সেই মেয়েটিকে যদি জোৰ কৰে তার স্বামীৰ গৃহে ফিৰে আসাৰ আদেশ দেওয়া হয় তাহলে তা মেয়েটিৰ প্ৰতি অবিচাৰ হবে।

ভাৰ্জিন স্ত্ৰী এৰ সাথে যৌন সম্পৰ্ক শুধুমাত্ৰে তাকে শাৰীৰিক দিক থেকে নয় মূল্যবোধেৰ দিক থেকেও পৰিবৰ্তিত কৰে। বিবাহেৰ মধ্য দিয়ে স্ত্ৰী আইনতভাবে তার স্বামীৰ সাথে যৌন সম্পৰ্কে লিপ্ত হতে পাৰে এবং তােদেৰ স্বামী স্ত্ৰীয়েৰ সম্পৰ্ক এই যৌন সম্পৰ্কেৰ মধ্য দিয়ে পূৰ্ণতা পায়। স্ত্ৰী বিবাহেৰ পৰ যৌন সম্পৰ্কেৰ মধ্য দিয়ে তার ভাৰ্জিনিটি হাৰায়। বৈবাহিক সম্পৰ্ক হল পাৰস্পৰিকতাৰ সম্পৰ্ক। স্ত্ৰী অন্যান্য পুৰুষেদেৰ বাতিল কৰে তার স্বামীৰ সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যৌন সম্পৰ্কে লিপ্ত হয়। পৰিবৰ্তে স্বামীও তার স্ত্ৰীয়েৰ স্বাস্থ্য, সুৰক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণেৰ দিকগুলোৰ খেয়াল রাখে। খুব কম সংখ্যক স্ত্ৰী বিবাহেৰ রাতে স্বামীৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰিত হওয়ার পৰ দ্বিতীয়বাৰ যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনেৰ মধ্য দিয়ে বৈবাহিক সম্পৰ্ক ধৰে রাখাৰ সুযোগ পান যদি না সেই স্ত্ৰী যৌনতাৰ ব্যাপাৰে নিৰ্লিপ্ত হয়। এই প্ৰসঙ্গে অলকা শৰ্মা বনাম অভিনেশ কুমাৰ শৰ্মা-ৰ কেসটি বিশেষভাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই কেস এ বিয়েৰ রাতে স্ত্ৰীয়েৰ আচৰণ এবং যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনেৰ ক্ষেত্ৰে তার নিৰ্লিপ্ততা, তার মানসিক সুস্থতা ও সন্তান প্ৰজননেৰ ক্ষমতাকে প্ৰশ্নেৰ মুখে দাড়া কৰিয়েছে এবং তােদেৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কও একইসাথে প্ৰশ্নেৰ মুখে এসে পড়েছে।

আইনেৰ চোখে যৌন সম্পৰ্কে সক্ষম হওয়ার জন্য পুৰুষেদেৰ ক্ষেত্ৰে যৌনাঙ্গ থাকা প্ৰয়োজন, এবং তা পেনিট্ৰেশনে সক্ষম হওয়া প্ৰয়োজন, তবে তারা এজাকুলেশনে সক্ষম কিনা, তােদেৰ বীৰ্য উৰ্বৰ কিনা এসব প্ৰশ্ন আইনেৰ চোখে গুৰুত্বহীন। অন্যদিকে মহিলােদেৰ ক্ষেত্ৰে তারা পেনিট্ৰেশন নিতে সক্ষম কিনা সেটাই আসল কথা। তােদেৰ ঋতুস্ৰাব হয় কিনা, তারা ডিম্বানু উৎপাদনে সক্ষম কিনা এসব প্ৰশ্ন দিয়ে সে যৌন সম্পৰ্কে সক্ষম কিনা তা নিৰ্ধাৰিত হয়না। এসব প্ৰশ্ন বন্ধ্যাত্বেৰ প্ৰসঙ্গে গুৰুত্বপূৰ্ণ। তবে একথাও ঠিক যে সন্তানেৰ জন্মদান বিবাহে পূৰ্ণতা দান কৰে এবং সন্তান প্ৰজননেৰ মধ্য দিয়ে স্বামী স্ত্ৰীয়েৰ সম্পৰ্ক অন্য মাত্ৰায় পৌঁছয়। মহিলােদেৰ মাতৃত্বেৰ স্বাদ নেওয়ার বাসনা বৰাবৰই থেকে এসেছে অন্যদিকে পুৰুষেদেৰ ক্ষেত্ৰে পিতৃত্বেৰ বাসনা অনেকটাই সংস্কৃতিৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীল।

এই প্রসঙ্গে Moore বনাম Valsa (1992) কেসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে স্বামী ভ্যাসেকটমি অপারেশান করিয়েছেন কিন্তু সে ব্যাপারে তার স্ত্রী কে কিছুই জানাননি।

বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সন্তান প্রজনন যা স্থান কাল নির্বিশেষে সব জায়গায় একরকম। মাতৃত্ব মহিলাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বাসনা। নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এই ভেবে যে তারাও মাতা ও পিতা হবে সময়ের সাথে সাথে। যদি কোন ব্যক্তি অস্বপচারের এর মাধ্যমে পিতৃত্ব থেকে বিরত থাকতে চায় তাহলে তার উচিত সে সম্পর্কে তার স্ত্রীকে অবহিত করা কারন তার এই সিদ্ধান্ত তার স্ত্রীর মাতৃত্বের স্বপ্নের উপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে কোন স্ত্রী যদি মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকেন অথবা নিজের যৌবন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তার ভ্রূণ হত্যা করেন তাহলে সেটাও তার স্বামীর প্রতি অন্যায় করা হবে।

যদিও সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে বিচারপতিরা মেয়েদের প্রাকৃতিক ও পুরুষদের সাংস্কৃতিক বাসনার প্রশ্ন তুলে ধরেন কিন্তু তারা একথাও স্বীকার করেন যে যৌন সম্পর্ক সুখী দাম্পত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং এটি স্বামী স্ত্রী দুজনকেই মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা প্রদান করে। যৌন সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক ধরে রাখা সম্ভব নয়। এই ধারণাটি খুব ভুল যে স্ত্রীদের কোণ যৌন চাহিদা নেই এবং তারা শুধুমাত্র তাদের স্বামীর যৌন বাসনা চরিতার্থ করে চলে, এবং স্ত্রীর স্বামীর যৌন বাসনা চরিতার্থ করার একটা মাধ্যম বিশেষ। স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক প্রতিটি পুরুষ ও মহিলার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং সেটা না থাকলে হতাশার সৃষ্টি হয়।

বিবাহ ও বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। বিবাহ চুক্তি না সংস্কার এই বিষয়ে যে দ্বন্দ্ব সে বিষয়েও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়।